অধ্যায় - ৩৩

উদীর মহিমা (ভাগ - ১)

বিছের কামড়, প্লেগের গাঁট, জামনেরের চমৎকার, নারায়ণ রাও, বালা বুওয়া সুতার, আপ্পাসাহেব কুলকার্ণী, হরি ভাউ কার্ণিক।

এর আগের অধ্যায়ে গুরুর মহানতার দিগ্‌দর্শন করানো হয়েছিল। এবার এই অধ্যায়ে 'উদীর' মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হবে।

প্রস্তাবনা ঃ-

আসুন, আগে আমরা সন্তদের চরণে প্রণাম করি, যাঁদের মাত্র কৃপাদৃষ্টি দ্বারা সমস্ত পাপ ভস্ম হয়ে আমাদের আচরণের দোষ নষ্ট হয়ে যাবে। তাঁদের উপদেশ আমাদের জন্য হয়ে ওঠে পরম শিক্ষাপ্রদ ও অক্ষয় সুখের বস্তু। তাঁরা নিজেদের মনে- "এটা আমার, ওটা তোমার" এমন কোন প্রভেদ রাখেন না। এই ধরনের মনোভাব স্বপ্নেও তাঁদের হৃদয়ে উৎপন্ন হয় না। তাঁদের ঋণ এই জন্মে ত দূর, অনেক জন্মেও শোধ করতে পারব না।

উদী (বিভূতি) ঃ-

এটা তো সবাই জানে যে, বাবা লোকেদের কাছ থেকে দক্ষিণা নিতেন এবং ঐ টাকা থেকে লোকেদের দান করার পর যা বাঁচত, সেটা দিয়ে কয়লা বা কাঠ কিনে সব সময় ধুনি প্রজ্জ্বলিত রাখতেন। এই ধুনির ভষ্মকে 'উদী' বলা হয়। শিরডী থেকে রওনা হওয়ার সময় ভক্তদের এই ভষ্ম মুক্তহস্তে বিতরণ করা হতো। এই 'উদী'র মাধ্যমে বাবা আমাদের কি শিক্ষা দিতেন? উদী বিতরণ করে বাবা আমাদের শেখাতেন যে এই জ্বলন্ত কয়লার ন্যায় গোচর ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিবিম্ব ভষ্মেরই সমান। আমাদের দেহ ইন্ধনের মতো অর্থাৎ পঞ্চভূতাদি দ্বারা নির্মিত, যেটি সাংসারিক ভোগাদির পর ধ্বংস হয়ে ভষ্ম রূপে পরিণত হয়ে যাবে। সব শেষে এই দেহটা ভষ্ম হয়ে যাবে- এই কথাটা স্মরণ করাবার জন্য বাবা উদী বিতরণ করতেন। এই উদীর দ্বারা তিনি আরো একটা শিক্ষা দিতেন- ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। এই সংসারে বস্তুতঃ কেউ কারো পিতা, পুত্র বা স্ত্রী নয়। আমরা এই জগতে একলাই এসেছি এবং একলাই চলে যাবো।

আগেও দেখা গেছে এবং এখনো অনুভব করা হয়, এই উদী অনেক শারীরিক এবং মানসিক রোগীদের স্বাস্থ্য প্রদান করেছে। আসলে বাবা ভক্তদের দক্ষিণা ও উদীর মাধ্যমে সত্য ও অসত্যের প্রতি বিবেক এবং অসত্য ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত বোঝাতে চাইতেন। আমারা উদীর মাধ্যমে বৈরাগ্য ও দক্ষিণার মাধ্যমে ত্যাগের শিক্ষা পাই। এই দুটি না থাকলে এই মায়ারূপী ভবসাগর পার করা কঠিন। তাই বাবা অন্যের ভোগ স্বয়ং ভোগ করে দক্ষিণা স্বীকার করতেন। ভক্তরা যখন রওনা হওয়ার অনুমতি নিতে যেত, তখন তিনি প্রসাদ রূপে খানিকটা উদী দিয়ে ও কিছুটা ওদের কপালে লাগিয়ে নিজের হাত ওদের মাথায় রাখতেন। বাবা প্রসন্ন চিত্তে থাকলে প্রেমপূর্বক গান গাইতেন। এমনি একটা ভজন উদীর বিষয়েও ছিল। ভজনের শব্দগুলি- রমতে রাম আয়ো জী, আয়ো জী, উদিয়া কী গোনিয়া লায়ো জী - "ঐ দেখো শ্রী রাম ভ্রমণ করতে করতে এসেছেন ও থলিতে উদী ভরে এনেছেন।" বাবা এই ভজনটি মধুর সুরে গাইতেন। এ তো হল উদীর আধ্যাত্মিক প্রভাব সম্বন্ধীয় কথা। কিন্তু এতে ভৌতিক প্রভাবও আছে, যার দ্বারা ভক্তরা স্বাস্থ্য, সমৃদ্ধি, চিন্তামুক্তি ও অনেক সাংসারিক লাভ প্রাপ্ত করে। তাই উদী আমাদের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক- দুরকমই লাভ প্রদান করে। এবার আমরা উদীর মহিমার কথা আরম্ভ করছি।

বিছের কামড় ঃ-

নাসিকে শ্রী নারায়ণ মোতীরাম জানী বাবার এক পরম ভক্ত ছিলেন। উনি বাবারই আরেক ভক্ত শ্রী রামচন্দ্র বামন মোডকের অধীনে কাজ করতেন। একবার উনি নিজের মাকে নিয়ে বাবার দর্শন করতে শিরডী আসেন। তখন বাবা ওঁর মাকে বলেন- "এবার তোমার ছেলের চাকরী ছেড়ে নিজের ব্যবসা শুরু করা উচিত।" কিছুদিনের মধ্যেই বাবার কথা সত্য হয়। নারায়ণ রাও চাকরী ছেড়ে, 'আনন্দ আশ্রম' নামক একটা উপহার সামগ্রীর দোকান খোলেন। একবার নারায়ণ রাও-য়ের এক বন্ধুকে বিছে কামড়ালো। অসহ্য যন্ত্রণায় কষ্ট পেতে লাগলেন। এ সব ব্যাপারে উদী একেবারে রামবাণ- কামড়ের জায়গায় শুধু লাগিয়ে দিতে হয়। নারায়ণ উদী খুঁজে পাচ্ছিলেন না। উনি বাবার ছবির সামনে দাঁড়িয়ে সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করেন। বাবার নাম নিয়ে তাঁর ছবির সামনে রাখা ধূপের থেকে এক চিমটে ভস্ম বাবার উদীর সমান মনে করে কামড়ের জায়গায় লাগিয়ে দিলেন। সেখান থেকে হাত সরাতেই ব্যথা তক্ষুনি কমে যায় এবং দুজনেই অত্যন্ত খুশী হয়ে নিজের-নিজের বাড়ী ফিরে যান।

প্লেগের গাঁট ঃ-

এক সময় বান্দ্রায় থাকাকালীন এক ভক্ত জানতে পারেন যে, ওর মেয়ে প্লেগগ্রস্ত এবং ওর শরীরে গাঁট বেরিয়ে এসেছে। ভক্তটির কাছে সেই সময় উদী ছিল না। তাই তিনি নানাসাহেব চাঁদোরকরের কাছে উদী দেওয়ার জন্য খবর পাঠান। যখন নানাসাহেবের কাছে এই খবর পৌঁছয় তখন উনি ঠানে ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে এবং স্ত্রীর সঙ্গে কল্যাণ যাচ্ছিলেন। ওঁর কাছেও সেই সময় উদী ছিল না। রাস্তা থেকে খানিকটা ধূলো উঠিয়ে শ্রীসাই বাবার ধ্যান করে এবং সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করে সেই ধূলোটি নিজের স্ত্রীর মাথায় লাগিয়ে দেন। ভক্তটি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে এই সব দেখছিলেন। বাড়ী ফিরে জানতে পারেন যে, যে সময় নানাসাহেব ঠানে ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে বাবার কাছে সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করেন, তখন থেকেই যথেষ্ট পরিবর্তনের ফলে মেয়ে আরাম পেয়েছে। মেয়েটি গত তিনদিন ধরে কষ্ট পাচ্ছিল।

জামনেরের বিলক্ষণ চমৎকার ঃ-

১৯০৪-০৫ সালে খানদেশ জেলার জামনের শহরে মাম্‌লৎদার ছিলেন- নানাসাহেব চাঁদোরকর। জামনের শিরডী থেকে প্রায় ১০০ মাইল দূরে। ওঁর মেয়ে ময়নাতাঈ ছিলেন আসন্ন প্রসবা। ২-৩ দিন আগে থেকে ওঁর প্রসব পীড়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। নানাসাহেব সব সম্ভব চেষ্টা করেন, কিন্তু কষ্ট কম হয় না। তখন উনি বাবার ধ্যান করে সাহায্য করতে প্রার্থনা করেন। ঐ সময় রামগীর বুওয়া, যাকে বাবা 'বাপুগীর বুওয়া' বলে ডাকতেন, শিরডী থেকে নিজের বাড়ী খানদেশে ফিরছিলেন। বাবা ওকে নিজের কাছে ডেকে বলেন- "তুমি বাড়ী যাওয়ার পথে কিছুক্ষণের জন্য জামনেরে নেমে এই উদী এবং আরতি শ্রী নানাসাহেবকে দিয়ে দিও।" রামগীর বুওয়া বলেন- "আমার কাছে তো মাত্র দু টাকা আছে। সেটা বোধহয় জলগ্রাম অবধি ভাড়া দিতেই শেষ হয়ে যাবে। তবে এই অবস্থায় সেখান থেকে আরো ৩০ মাইল যাওয়া আমার পক্ষে কি করে সম্ভব হবে?" তাতে বাবা উত্তর দেন- "চিন্তা করো না। তোমার সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।" বাবা শামাকে দিয়ে মাধব অডগর দ্বারা রচিত প্রসিদ্ধ আরতির প্রতিলিপি তৈরী করিয়ে উদীর সাথে নানাসাহেবের জন্য পাঠিয়ে দেন। বাবার আশ্বাস পেয়ে রামগীর বুওয়া শিরডী থেকে প্রস্থান করেন এবং প্রায় রাত্তির পৌনে তিনটের সময় জলগ্রামে এসে পৌঁছন। ওঁর পকেটে তখন দু আনা পয়সা। বড়ই অসুবিধেজনক অবস্থা। এমন সময় উনি একটি আওয়াজ শুনতে পান - 'শিরডী থেকে একজন বাপুগীর বুওয়া এসেছেন, তিনি কে?" উনি এগিয়ে গিয়ে বলেন- "আমিই শিরডী থেকে আসছি।,

আমার নাম বাপুগীর বুওয়া।" তখন ঐ চাপরাশীটি ওঁকে নিয়ে বাইরে এসে একটা সুন্দর টাঙ্গাতে বসায়। সে জানায় যে সে নানাসাহেব চাঁদেরকরের নির্দেশেই তাঁকে জামনের নিয়ে যেতে এসেছে। এবার ওঁরা দুজনে রওনা হন। মাঝে ঘোড়া দুটিকে জল খাওয়ানোর জন্য টাঙ্গা থামানো হয়। সেই সময় চাপরাশীটি রামগীর বুওয়াকেও জলপান করতে অনুরোধ করে। লোকটির দাড়ি-গোঁফ ও বেশভূষা দেখে তাকে মুসলমান ভেবে রামগীর বুওয়া জলপান করতে অস্বীকার করেন। তখন চাপরাশীটি জানায় যে, সে গাড়ওয়ালের ক্ষত্রিয় বংশের হিন্দু। ঐ সব জলখাবার নানাসাহেবই বুওয়ার জন্য পাঠিয়েছেন। তাই ওঁর তাতে আপত্তি বা সন্দেহ করা উচিত নয়। এরপর দুজনে জলপান করে আবার রওনা হন এবং সূর্যোদয় কালে জামনের পৌঁছন। রামগীর বুওয়া প্রস্রাব করতে যান। একটু পরেই ফিরে এসে দেখেন যে, সেখানে টাঙ্গা, টাঙ্গার দুটি ঘোড়া ও সেই চাপরাশীটি (সহিস) কেউই নেই। ওঁর মুখ থেকে একটা শব্দও বেরোয় না। উনি কাছের কাছারীতে খোঁজ করতে যান এবং সেখানে জানতে পারেন যে, এই সময় মাম্‌লৎদার নিজের বাড়ীতেই আছেন। বাপুগীর নানাসাহেবের বাড়ী গিয়ে পৌঁছন এবং ওঁকে বলেন- "আমি শিরডী থেকে বাবার আরতি ও উদী নিয়ে এসেছি।" সেই সময় ময়নাতাঈয়ের অবস্থা খুবই চিন্তাজনক। নানাসাহেব ভাবেন যে বাবার সাহায্য খুবই সাময়িক। কিছুক্ষণ পরই খবর আসে যে প্রসব সকুশলে ও নির্বিঘ্নে হয়ে সমস্ত ব্যথা দূর হয়ে গেছে। এরপর রামগীর বুওয়া নানাসাহেবকে ষ্টেশনে টাঙ্গার সাথে খাবার পাঠানোর জন্য ধন্যবাদ জানান। সে কথা শুনে নানা সাহেব অবাক হয়ে বলেন- "আমি তো কোন টাঙ্গা বা চাপরাশী পাঠাইনি আর শিরডী থেকে আপনার আগমনের কোন খবরও পাইনি।" ঠানের শ্রী বি. ভি. দেব এই সম্বন্ধে শ্রী নানাসাহেব চাঁদোরকরের পুত্র বাপুসাহেব চাঁদোরকর এবং শিরডীর রামগীর বুওয়াকে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তারপর সন্তুষ্ট হয়ে শ্রী সাই লীলা পত্রিকা ১৩ তে গদ্য ও পদ্য রূপে একটি সুন্দর রচনা প্রকাশ করেন। শ্রী নরসিংহ স্বামী ১) ময়নাতাই (ভাগ ৫, পৃষ্ঠ ১৪) ২) বাপুসাহেব চাঁদোরকর (ভাগ ২০, পৃষ্ঠ ৪০) এবং ৩) রামগীর বুওয়ার (ভাগ ২৭, পৃষ্ঠ ৮৩) বক্তব্য নিজের বই "ভক্তদের অভিজ্ঞতা" (ভাগ-৩) প্রকাশ করেছেন। নিম্নলিখিত প্রসঙ্গ রামগীর বুওয়ার কথানুসারে উদ্ধৃত করা হচ্ছে -

"একদিন বাবা আমায় নিজের কাছে ডেকে একটা উদীর পুরিয়া এবং একটা আরতির প্রতিলিপি দিয়ে বলেন- "যামনের যাও। এই আরতি ও উদী নানাসাহেবকে দিয়ে দিও।" আমি বাবাকে জানাই যে আমার কাছে মোট দু টাকাই আছে। কোপরগ্রাম থেকে জলগ্রাম এবং সেখানে থেকে গরুর গাড়ীতে জামনের যাওয়ার জন্য এই টাকায়

কুলোবে না। বাবা বলেন- "আল্লাহ দেবেন।" আমি শুক্রবারে রওনা হই। মনমাড বিকেল ৬.৩০ মিনিটে ও জলগ্রাম রাত্রি দুটো বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিটে পৌঁছই। সেই সময় প্লেগ সংক্রান্ত বিধিনিষেধের কড়াকড়ি ছিল। তাই আমার একটু অসুবিধেই হয়। আমার চিন্তা হচ্ছিল- জামনের যাই কি করে? রাত্তির তিনটে নাগাদ পায়ে বুট ও মাথায় পাগড়ী পরা একটি চাপরাশী এসে আমায় টাঙ্গায় বসতে বলে এবং আমরা সেই টাঙ্গায় রওনা হই। আমার বেশ ভয় হচ্ছিল। রাস্তায় জলপানও করি। ভোরবেলা জামনের পৌঁছই। প্রস্রাব করার পর ফিরে এসে দেখি যে সেখানে কিছুই নেই। টাঙ্গা ও টাঙ্গাওয়ালা অদৃশ্য।"

নারায়ণ রাও ঃ-

ভক্ত নারায়ণ রাও বাবার তিনবার দর্শন পান। বাবা সমাধিস্থ (১৯১৮) হওয়ার তিন বছর পর উনি শিরডী যেতে চাইতেন। কিন্তু কোন-না-কোন কারণে যাওয়া হয়ে উঠছিল না। বাবার মহাসমাধির পর এক বছরের মধ্যেই উনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। কোন চিকিৎসাই কাজে লাগে না। তখন উনি অষ্টপ্রহর বাবার ধ্যান করা শুরু করেন। এক রাতে উনি স্বপ্ন দেখেন যে বাবা একটা গুহা থেকে বেরোচ্ছেন এবং সান্ত্বনা দিয়ে বললেন- "ভয় পেও না। তুমি কাল থেকেই আরাম পেতে শুরু করবে এবং এক সপ্তাহের মধ্যেই চলতে-ফিরতে পারবে।" ঠিক অতটা সময়ের মধ্যে নারায়ণ রাও সুস্থ হয়ে ওঠেন। এবার চিন্তা করার কথা এই যে, বাবাকে কি দেহে থাকাকালীনই জীবিত মানা উচিত এবং যেহেতু দেহত্যাগ করে দিয়েছেন বলে কি মৃত মানা হবে? না। বাবা অমর- কারণ তিনি জন্ম-মৃত্যুর বাইরে। **একবার অনন্য ভাবে যে তাঁর শরণাপন্ন হয়, সে যেখানেই থাকুক না কেন, তাকে তিনি সাহায্য অবশ্যই করেন। তিনি সর্বদা আমাদের সঙ্গেই আছেন এবং যে কোন রূপে ভক্তের সামনে প্রকট হয়ে তার ইচ্ছে পূরণ করেন।**

আপ্পাসাহেব কুলকর্ণী ঃ-

১৯১৭ সালে আপ্পাসাহেব কুলকার্ণীর জীবনে ভালো সময় আসে। ওঁর ঠানেতে স্থানান্তরণ হয়। বালাসাহেব ভাটে ওঁকে বাবার একটা ছবি দেন। আপ্পাসাহেব সেই ছবিটি পূজো করতে শুরু করেন। উনি পবিত্র মনে পূজো করতেন। রোজ বাবাকে চন্দন এবং নৈবেদ্য অর্পণ করতেন। বাবার দর্শন করার ওঁর তীব্র ইচ্ছে ছিল। এই সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে উৎসুক হয়ে বাবার ছবিকে দেখাই বাবার প্রত্যক্ষ দর্শনের সমান। নীচে লেখা ঘটনাটি এই কথাটি প্রমাণ করে।

বালাবুওয়া সুতার ঃ-

বালাবুওয়া নামক বম্বেতে এক সাধু (মহাপুরুষ) ছিলেন। নিজের ভক্তি, ভজন ও আচরণের জন্য উনি আধুনিক তুকারাম নামে বিখ্যাত ছিলেন। ১৯১৭ সালে উনি শিরডী আসেন। বাবাকে প্রণাম করতেই বাবা বলেন- "আমি একে গত চার বছর থেকে জানি।" বালাবুওয়া খুব আশ্চর্য্য হন। উনি মনে-মনে ভাবেন- "আমি তো প্রথমবার শিরডী এসেছি, তাহলে এটা কি করে সম্ভব হতে পারে?" অনেকক্ষণ চিন্তা করার পর উনি বাবার কথার যথার্থ অর্থ বুঝতে পারেন। উনি মনে-মনেই বলেন- "সন্তরা কত সর্বব্যাপক ও সর্বজ্ঞানী এবং ভক্তদের প্রতি তাঁদের হৃদয়ে অফুরন্ত দয়া। আমি তো কেবল তাঁর ছবিকেই প্রণাম করেছিলাম। সেটাও বাবা জানতে পেরে গেছেন। তাই তিনি আমাকে জানিয়ে দিলেন যে **বাবার ছবি দেখাও যা, বাবাকে দেখাও তাই।**

এবার আমরা আপ্পাসাহেবের ঘটনায় ফিরে আসি। ঠানেতে থাকাকালীন ওঁকে একবার কোন কাজে ভিবণ্ডী যেতে হয় যেখান থেকে এক সপ্তাহ আগে ফেরা সম্ভব ছিল না। ওঁর অনুপস্থিতিতে তৃতীয় দিন ওঁর বাড়ীতে নিম্নলিখিত বিচিত্র ঘটনাটি ঘটে। দুপুর বেলা আপ্পাসাহেবের বাড়ীতে একটি ফকির আসেন, যাঁর চেহারা বাবার ছবির সাথে হুবহু মিল ছিল। শ্রীমতি কুলকার্ণী ও ছেলে মেয়েরা ওঁকে জিজ্ঞাসা করে- "আপনি শিরডীর শ্রীসাই বাবা তো নন?" এর উত্তরে ফকিরটি জানান যে উনি সাইবাবার আজ্ঞাকারী সেবক এবং তাঁর আদেশ অনুসারেই ওদের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করতে এসেছেন। ফকির দক্ষিণা চান এবং শ্রীমতি কুলকার্ণী ওঁকে এক টাকা দেন। তখন ফকির ওঁকে একটা পুরিয়া দিয়ে বলেন- "এটা নিজের পূজোর জায়গায় ছবির সাথে রেখো।' এই বলে উনি তাদের কল্যাণ কামনা করে সেখান থেকে চলে যান। এবার বাবার অদ্ভুত লীলার কথা শুনুন।

ভিবণ্ডীতে আপ্পাসাহেবের ঘোড়া অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাই উনি কাজে এগোতে পারেন না। তখন সেই রাত্তিরেই উনি বাড়ী ফিরে আসেন। বাড়ী পৌঁছতেই বৌয়ের কাছে ফকিরের আগমনের খবর পান। ওঁর মন এই ভেবে অশান্ত হয়ে উঠে যে তিনি ফকিরের দর্শন পেলেন না। এবং স্ত্রী যে শুধু এক টাকা দক্ষিণা দেন সেটাও ওঁর ঠিক পছন্দ হয় না। উনি বলেন- "আমি হলে ১০ টাকার কম কখনোই দিতাম না।" তখন উনি খালি পেটেই ফকিরের খোঁজে বেরিয়ে পড়েন। মস্‌জিদ ও অন্যান্য অনেক জায়গায় খোঁজেন কিন্তু সবই ব্যর্থ হয়। পাঠকগণ! অধ্যায় ৩২তে বাবার কথাগুলি

স্মরণ করুন - **'খালি পেটে ঈশ্বরের খোঁজ করা উচিত নয়।"** আপ্পাসাহেব এই শিক্ষাটি পেয়ে যান। খাবার খাওয়ার পর যখন উনি শ্রী চিত্রের সাথে বেড়াতে বেরোন, তখন একটু দূরে যেতেই দেখেন যে, সামনে থেকে একটি ফকির দ্রুত গতিতে ওঁর দিকেই এগিয়ে আসছেন। আপ্পাসাহেব ভাবেন- "এঁকে দেখে ঐ ফকিরটি বলেই তো মনে হচ্ছে। এঁকে দেখতেও ঠিক বাবার (ছবির) মতনই।" ফকির কাছে আসতেই হাত বাড়িয়ে দক্ষিণা চান। আপ্পাসাহেব ওঁকে এক টাকা দেন, তখন উনি আরো টাকা চান। এবার আপ্পাসাহেব দু টাকা দেন, তাও ফকিরের মন ভরে না। উনি নিজের বন্ধুর কাছ থেকে তিন টাকা নিয়ে ফকিরকে দেন। তবুও ওকে দেখে ঠিক সন্তুষ্ট হয়েছেন বলে হচ্ছিল না এবং উনি আরো চাইছিলেন। তখন আপ্পাসাহেব ফকিরকে তাঁদের সঙ্গে বাড়ী আসতে অনুরোধ জানান। বাড়ীতে এসে ফকিরকে আরো তিন টাকা দিলেন- সবশুদ্ধ নয় টাকা হল। কিন্তু ফকির আবার দাবী করলেন। তখন আপ্পাসাহেব বলেন- "আমার কাছে ১০ টাকার একটা নোট আছে।" ফকির সেই নোটটি নিয়ে ঐ ৯ টাকা ফিরিয়ে সেখান থেকে চলে যান। আপ্পাসহেব ১০ টাকা দেবেন বলেছিলেন, তাই ওর কাছ থেকে ১০ টাকা নিয়ে নেন। তিনি বাবার স্পর্শ করা ৯ টাকা ফেরত পান। ৯ সংখ্যাটি খুবই অর্থপূর্ণ এবং নববিধা ভক্তির দিকে ইঙ্গিত করে (দেখুন অধ্যায় ২১)। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, লক্ষ্মীবাঈকেও শেষ সময় বাবা ৯ টাকা দিয়েছিলেন।

উদীর পুরিয়া খুলে আপ্পাসাহেব দেখেন যে, তার মধ্যে ফুলের পাঁপড়ি ও চাল রাখা আছে। কালান্তরে উনি যখন শিরডী যান, তখন বাবা ওঁকে নিজের একটি চুলও দিয়েছিলেন। উনি উদী ও চুল একটা মাদুলিতে রেখে সেটা সর্বদা হাতে বেঁধে রাখতেন। আপ্পাসাহেব উদীর শক্তি বুঝতে পেরেছিলেন। প্রথমে উনি চল্লিশ টাকা বেতন পেতেন। কিন্তু বাবার উদী পাওয়ার পর ওঁর বেতন অনেক বেড়ে যায় এবং উনি মান ও খ্যাতি লাভ করেন। এই অস্থায়ী আকর্ষণ ছাড়াও ওঁর আধ্যাত্মিক উন্নতিও হয়। তাই সৌভাগ্যক্রমে যাদের কাছে উদী আছে, তাদের স্নান করার পর সেটি কপালে লাগানো উচিত এবং একটু জলে মিশিয়ে তীর্থের ন্যায় গ্রহণ করা উচিত।

হরিভাউ কার্ণিক ঃ-

১৯১৭ সালে গুরু পূর্ণিমার দিন (ডহানু জেলার) ঠানের হরিভাই কার্ণিক শিরডী আসেন এবং উনি বাবার যাথাবিধি পূজো করেন। নৈবেদ্য ও দক্ষিণা ইত্যাদি অর্পণ করে শামার মাধ্যমে বাবার কাছে থেকে ফিরে যাওয়ার অনুমতি প্রাপ্ত করেন। মস্‌জিদের সিঁড়ি নেমেই ওঁর মনে হয় যে বাবাকে আরো এক টাকা অর্পণ করা উচিত। উনি

শামাকে ইশারায় ওঁর এই ইচ্ছেটি জানাতে চাইছিলেন- বাবার অনুমতি পাওয়ার পর ফের সিঁড়ি উঠতে ওঁর মন চাইছিল না। কিন্তু শামার ওঁর উপরে চোখ পড়ে না। তাই উনি বাড়ীর দিকে রওনা হয়ে যান। রাস্তায় নাসিকে উনি শ্রীকালা রামের মন্দির দর্শন করতে যান। সন্ত নরসিংহ মহারাজ মন্দিরের মুখ্য দ্বারের কাছেই বসেছিলেন। হঠাৎ তিনি ভক্তদের ওখানেই ছেড়ে হরিভাউ-য়ের কাছে এসে ওঁর হাত ধরে বলেন- "আমার টাকাটা দাও।" কার্নিক খুবই আশ্চর্যান্বিত হন এবং সহর্ষে টাকাটা দিয়ে ভাবেন- "আমি বাবাকে এই টাকাটা দেব ভেবেছিলাম। তাই বাবা নরসিংহ মহারাজের রূপে সেটা নিয়ে নিলেন।" এই কাহিনীটি প্রমাণ করে যে সব মহাপুরুষেরাই মূলতঃ অভিন্ন এবং তাঁরা কোন-না-কোন ভাবে একত্র হয়ে কাজ করেন।

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু।।